অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০৭ ▪ জুলাই ২০১৯

আলাপ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০৭
জুলাই ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক
ইরাজ আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

আলাপ পত্রিকার জুলাই সংখ্যা প্রকাশিত হতে দেরি হলো। এই দেরির জন্য প্রথমেই পাঠকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। জুলাই মাসের সংখ্যাটি আমরা আগের মতো প্রায় সব নিয়মিত বিভাগ দিয়েই সাজিয়েছি। মূল রচনায় রয়েছে নেত্রকোনা জেলার সাবিনা ইয়াসমীনের কথা। সাবিনা পরিকল্পিত ভাবে মাছের চাষ করে এখন স্বনির্ভর নারী। সাবিনা বরাবরই কিছু একটা করে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন। প্রথমে ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নেন। তারপর পারিবারিক কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করেন।এবার নিজের পুকুরে শিং, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের পোনা ছাড়েন। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রথম বার মাছ চাষে প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়। মাছচাষে এই সফলতা পাওয়ায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। আর এই প্রেরণা থেকেই আজ সাবিনা ইয়াসমীন জয় করেছেন সংসারের দারিদ্র।

এই সংখ্যায় জেনে নেই বিভাগে রয়েছে ছাগল পালন নিয়ে একটি লেখা। আছে নোটিশবোর্ড বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা আপনাদের কাজে লাগবে। এছাড়াও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে বিভিন্ন লেখা তো রইলোই। সবাই ভালো থাকবেন এই আশাই করি। ■

সূচিপত্র

- মাছ চাষে স্বাবলম্বী সাবিনা ইয়াসমীন ১ - ২
- আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ৩- ৪
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সম্ভাবনা ৫ - ৯
- প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ১০ - ১১
- আমাদের সংলাপ ১২
- খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতা ১৩

মাছ চাষে স্বাবলম্বী সাবিনা ইয়াসমীন

মূল রচনা

লিজ নেয়া পুকুরে মাছ চাষে ব্যস্ত সাবিনা ইয়াসমীন ও অন্যান্যরা

নেত্রকোনা জেলা সদরের বড় কাইলাটি গ্রাম। সে গ্রামে কিছু দূরে দূরে চোখে পড়বে ছোট, বড় ও মাঝারি পুকুর। বেশির ভাগ পুকুরেই পরিকল্পিত ভাবে মাছ চাষ করা হয়। আগে অনেকগুলো পুকুর খালি পড়ে থাকতো। এখন সেগুলোও মাছ চাষের আওতায় এসেছে। এই বড় কাইলাটি গ্রামের একজন গৃহবধূ সাবিনা ইয়াসমীন। সাবিনা মাস্টার্সে পড়ছেন। আর তার ফাঁকে পরিকল্পিত ভাবে মাছ চাষ করছেন। এখন নিজেকে একজন আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাশাপাশি গ্রামের অন্যদের জন্যেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন।

তিন-চার বছর আগেও সাবিনার সংসারে প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল। দুই ছেলে এবং শ্বাশুড়ি সহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন। সাবিনার স্বামী বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের হিসাব রক্ষক ছিলেন। তার একার উপার্জনে সংসারে ৫ জনের খাওয়া-পরা কোনো রকমে চলছিল। তবে সাবিনার পড়ালেখার খরচ চালান কঠিন ছিল। তাই পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। মাঝে মাঝে অন্যের সাহায্য নিয়ে সংসার চালাতে হতো। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে ২০০৯ সালে বিয়ে হয় সাবিনার। বিয়ের পরও সাবিনা পড়ালেখা বন্ধ করেননি। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি পড়ালেখা চালিয়ে যান। স্বপ্ন দেখেন নিজ পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার।

তাই স্বামীর পাশাপাশি সাবিনা নিজেও কিছু কাজ করার জন্য মনস্থির করেন। সাবিনা

সাবিনা ইয়াসমীন

উপায় খুঁজতে থাকেন। সাবিনা জানতেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিলে আত্ম-কর্মসংস্থান হবে। ২০১১ সালে সাবিনা স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করেন। তারপর স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদফতর থেকে মাছচাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু মাছ চাষের জন্যে অর্থের জোগান আসবে কোত্থেকে? এই চিন্তায় তখন সাবিনা উদ্বিগ্ন। তারপর পাশের বাড়ির নারীদের মাধ্যমে জানতে পারেন বড়কাইলাটি গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কথা। সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য মিশন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলাকার অনেক নারীই মিশনের ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতাও পেয়েছেন। জেলি মহিলা উন্নয়ন সমিতি নামে সাবিনাদের গ্রামে আহ্ছানিয়া মিশনের একটি সমিতি ছিল। সমিতির সদস্যদের পরামর্শে ২০১১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাবিনা সমিতির সদস্য হন।

প্রথমে ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নেন। তারপর পারিবারিক কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করেন। এবার নিজের পুকুরে শিং, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের পোনা ছাড়েন। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রথম বার মাছ চাষে প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়। মাছচাষে এই সফলতা পাওয়ায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। তাই দ্বিতীয় দফায় আরো ক'টি পুকুর লিজ নেন। লাভের টাকা এবং মিশন থেকে দ্বিতীয় দফায় আরও ৫০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ নেন। মাছ চাষের প্রকল্প সম্প্রসারণ করেন। এভাবে পঞ্চাশ শতক জমি পরিমাণ পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। এখন তিনি ১২০ শতক জমির পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করছেন। সাবিনা ইয়াসমীন এখন বছরে তিনবার পুকুরে মাছ চাষ করেন। বর্তমানে ডিএফইডি থেকে ৪র্থ বারে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। চলতি বছরের ২৩ মার্চ পঞ্চাশ শতাংশ পরিমাণ জমির পুকুরে ৩৮০ কেজি মাছ ছাড়েন। এতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা আছে। এই মাছ বিক্রির সময় হবে জুন মাসে। পাশের আরো দু'টি পুকুরে মাছ ছেড়েছেন তিনি। মাছের খাবার ও অন্যান্য খরচ সহ সবমিলিয়ে খরচ হবে চারলাখ টাকা। প্রায় সাত লাখ টাকার ওপরে মাছ বিক্রি করবেন বলে সাবিনার আশা।

পরিকল্পিত ভাবে মাছ চাষ করে সাবিনা ইয়াসমিন আজ স্বাবলম্বী। সংসারে আর অভাব অনটন নেই। জয় করেছেন দারিদ্র্যকে। মাছ চাষ করে লাভের টাকায় বাড়িতে বসিয়েছেন সাবমারসিবল পাম্প। যা দিয়ে তিনি পুকুরে পানি সরবরাহ করেন। পাশের আরও দু'টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছেন।এখন পাকা ঘরবাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন। মাছের খামার উদ্যোগটিকে সম্প্রসারণে সাবিনাকে সহযোগিতা করছেন স্বামী মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন খোকন। চাকুরী ছেড়ে সাবিনার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেছেন তিনি।

দুলাল চন্দ্র দেবনাথ, এরিয়া ম্যানেজার, নেত্রকোনা, ডিএফইডি

আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

নোটিশ বোর্ড

আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণরত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যশোর ২০০৬ সাল থেকে যশোর এলাকায় কারিগরি শিক্ষার ওপর কাজ করে আসছে। অদক্ষ, বেকার জনশক্তিকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে শ্রম বাজারে দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রবেশ ঘটানো এবং শ্রম অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিই এই ইন্সটিটিউটের উদ্দ্যেশ্য। বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে ৫টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বিষয়গুলো হচ্ছে, (ক) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং (খ) ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং (গ) সার্টিফিকেট ইন বিউটিফিকেশন (ঘ) প্লাম্বিং এবং পাইপ ফিটিং (ঙ) কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন। দেশ স্বীকৃত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (BTEB) মানদণ্ড ব্যবহার করে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের সরকারি সনদও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি মিশনের রেজিস্ট্রার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (আরটিও) সেন্টার হিসেবে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের

স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে অনেক ছেলে মেয়ে আজ নিজে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সেখানে অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তি। আর এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সে দেশের তরুণ জনগোষ্ঠি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা অর্জিত হয়না। এ কারনে তারা পরিবার ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কর্মসূচিভুক্ত দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত সদস্যদের ১৩ টি কারিগরি ট্রেডের আওতায় তিন মাস ও ছয় মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রদানের সুয়োগ রয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ও নৃতাত্বিক জাতিগোষ্ঠকেও প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

তিন মাস ও ছয় মাস মেয়াদী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সহ সর্বমোট ২২টি দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছে। এরা প্রশিক্ষণ শেষে নিজস্ব জব প্লেসমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগের দায়িত্বও পালন করবে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ এর SEIP প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং জব ফেয়ার আয়োজনে সহযোগিতা করবে।

এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পিকেএসএফ এর সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক নিম্মোক্ত ৪টি প্রশিক্ষণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেঃ

- ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
- ফ্যাশন গার্মেন্টস
- প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সম্ভাবনা

জেনে নেই

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ছাগল পালনের গুরুত্ব রয়েছে

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ছাগল পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কেউ স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ছাগল পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন। ছাগল-পালন হয়ে উঠতে পারে ভূমিহীন কৃষক, দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের একটি উপায়। ছাগলের মাংস উন্নতমানের প্রাণিজ আমিষের উৎস। ছাগলের দুধ সহজে হজম হয়। গ্রাম বাংলার নারীরা বাড়তি আয়ের উৎস হিসাবে ছাগল পালন করে আসছেন। ছাগলের চামড়াও উন্নতমানের। এই চামড়া রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূর করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

ছাগল পালনের গুরুত্বঃ

পারিবারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই কাজ অনায়াসে করা যায়। ছাগলের লাদি জৈব সারের যোগান দেয়। ছাগল বিক্রি সহজ; যখন তখন বিক্রি করা যায়। নারীরা খুব সহজেই এই প্রকল্প পরিচালনা করতে পারে। এই কাজের জন্য তেমন কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। প্রাথমিকভাবে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করা যায়। ছাগলের রোগ বালাই তুলনামূলক কম হয়। ১২ মাসে দুইবার বাচ্চা পাওয়া যায়।

ছাগল পালনের সুবিধাঃ

- ছাগলের দুধ খুবই পুষ্টিকর ও এলার্জির উপসর্গ উপশমকারী।
- বেঙ্গল ছাগলের মাংস সুস্বাদু এবং চামড়া আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত।
- বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক। দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী।

- ছাগল পালনে অল্প জায়গা লাগে ।পরিবারের সদস্যরা দেখাশুনা করতে পারে।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। তাই খুব অল্প সময়ে সুফল পাওয়া যায়।
- একটি ছাগী বছরে ২বার এবং প্রতিবারে ১-৪টি বাচ্চা দেয়।
- খাদ্য খরচ কম এবং খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ।
- সকল ধর্মাবম্বী লোকজনের কাছে ছাগলের মাংস সমাদৃত।
- ছাগল পালন করে রোজগারের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।
- ছাগলের জন্য বড় পশুর মত চারণভূমির প্রয়োজন হয় না।
- বাড়ির আশ-পাশের গাছ গাছড়ার পাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ছাগলের জন্য গরু-মহিষের মত অধিক খাদ্য, উন্নত বাসস্থান বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না।
- স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি ছাগল পালন করে পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে।

ছাগলের জাত পরিচিতিঃ

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের ছাগল রয়েছে। বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল, যমুনাপারী, বারবারী জাতের ছাগল দেখা যায়। তবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বেশী উপযোগী। এদেশে কালো রঙের যে ছাগল পাওয়া যায় তাকে ব্ল্যাক বেঙ্গল বলে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল শুধু কালো রঙের হয় না। কালো রং ছাড়াও সাদা ও ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস সারা বিশ্বে খুব চাহিদা রয়েছে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল/দেশী জাতের ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

- আকারে ছোট কিন্তু মোটাসোটা।
- এক সঙ্গে ২/৪ টি বাচ্চা দেয়।
- লোম ছোট ও মসৃণ।
- পাঁঠার ওজন ২০ - ৩০ কেজি।
- ছাগীর ওজন ১৫ থেকে ২৫ কেজি।
- খাসীর ওজন ২০ থেকে ৩৫ কেজি।
- ছাগীর শিং ছোট, সরু ও উর্দ্ধমুখী।
- কিন্তু পাঁঠার শিং তুলনামূলক ভাবে বড়,মোটা এবং পিছনের দিকে বাঁকানো।
- কিছু কিছু পাঁঠা ও ছাগীর দাঁড়ি থাকে।

বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের উপযোগীতাঃ

এই ছাগল আমাদের দেশের আবহাওয়ায় উপযোগী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। চামড়া খুবই মূল্যবান যা বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এরা প্রতিবার ২-৪ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। বছরে দুইবার বাচ্চা পাওয়া যায়। মাংস এবং দুধ খুবই উৎকৃষ্ট মানের। ছাগল লালন-পালন ও চিকিৎসা খরচ অন্যান্য পশুর তুলনায় অনেক কম।

ভাল জাতের ছাগীর বৈশিষ্ট্যঃ

- মাথা লম্বা ও মাঝারী, চোয়াল সুগঠিত ও নাসারন্ধ্র খোলা হবে।
- মাথা সব সময় উঁচু থাকবে।
- বুক মাঝারী আকারের গভীর ও বেশ চওড়া হবে। সামনের পা সোজা ও শক্ত হবে।
- খুর চারটি মাটিতে সমান্তরালভাবে পড়বে।
- পাজরগুলো বাঁকানো হবে। চামড়া নরম চকচকে ও আলগা এবং লোম তেল-চকচকে ও ছোট হবে।

ছাগলের বাসস্থানঃ

ছাগল পালনের জন্য খুব উন্নতমানের বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না। ছাগল সাধারণত: শুস্ক আবহাওয়া, পরিস্কার, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ ও প্রচুর আলো বাতাস চলাচলকারী পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। ভেজা স্যাঁত-স্যাঁতে, গোবরযুক্ত, দুর্গন্ধময়, বদ্ধ ও অন্ধকার পরিবেশ ছাগলের রোগ বালাই এর উৎস হিসেবে কাজ করে। নিউমোনিয়া, চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি সংক্রামক ও পরজীবি রোগ হতে পারে। ফলে ছাগলের ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ এবং প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে সাধারণত পারিবারিক পর্যায়ে ছাগল পালন করা হয়। আলাদা বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হয় না। যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তাঁরা ছাগলের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করেন। এসব ঘর নির্দিষ্ট কোন মাপে তৈরী করা হয় না। ছাগী, পাঠা, বাচ্চা একই ঘরে রাখা হয়। ছাগলের খামারের জন্য আলাদা ঘর তোলার সময় বিবেচনা করতে হয়ঃ

ক. ছাগলের বাসস্থানের গুরুত্বঃ

১. নিরাপত্তার জন্য। প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য।

২. বিশ্রামের জন্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য।

খ. ঘরের অবস্থানঃ

১. পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বি ঘর তৈরী করা উচিত।

২. ঘরের দক্ষিণ দিকে খোলামেলা হবে যাতে দক্ষিণের বাতাস ঘরে ঢুকতে পারে।

৩. ঘরের উত্তর দিকে গাছপালা লাগাতে হবে।

৪. ভূমি থেকে ঘরের মেঝের উচ্চতা ০.৫ মিটার হওয়া উচিত।

একটি ছাগী বছরে দুই বার বাচ্চা প্রসব করে

গ) ঘরের আয়তন বা মাপঃ

১. একটি ছাগলের জন্য কমপক্ষে চর্তুদিকে ১.৫ মিটার বর্গাকার জায়গা প্রয়োজন

২. দো'চালা বা চার চালা ঘর হলে দেয়াল কমপক্ষে ২-২.৫ মিটার উচ্চতার হতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত আলো বাতাস যাতে ঘরে প্রবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ছাগল প্রায় সব ধরনের লতা-পাতা খেতে পছন্দ করে। সব সময়ে একই ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে না। অন্য পশুর ফেলে দেয়া বা নোংরা করা খাবার ছাগল পছন্দ করে না। কাঠাঁল পাতা, কলা পাতা, ইপিল-ইপিল পাতা পেয়ারা পাতা, বড়ই পাতা ছাগলের প্রিয় খাদ্য। ছাগলকে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি তৈরীকৃত সুষম/দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

ছাগলের বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়ানো এবং পাশাপাশি সুষম খাদ্য সরবরাহঃ

- জন্মের পর পরই ছাগল ছানাকে ছাগীর শাল দুধ দিতে হবে।
- শাল দুধ বাচ্চার পুষ্টি যোগায় এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

- কমপক্ষে তিন মাস (১২ সপ্তাহ) পর্যন্ত বাচ্চাকে ছাগীর দুধ দেওয়া উচিত।
- দুই সপ্তাহ পর থেকে বাচ্চাকে অল্প পরিমাণ সুষম খাদ্য দেওয়া যাবে।

ছাগলের বাচ্চাকে (পাঁঠা) খাসীকরণঃ

ছাগলের বাচ্চাকে ১৪-২৮ দিন বয়সের মধ্যেই খাসী করানোর উপযুক্ত সময়। উপযুক্ত সময়ে ছাগলের বাচ্চাকে খাসীকরণ করা হলে তুলনামূলক দাম বেশী পাওয়া যায়। বাজারে খাসীর চাহিদা বেশী। খাসীর মাংস পাঁঠার চেয়ে উৎকৃষ্ট। খাসীকরণে তেমন কোন খরচ হয় না।

ছাগলের প্রজননঃ

ছাগী বছরে দুই বার বাচ্চা দেয়। প্রতি বার ২ থেকে ৪টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। সাধারণত ৪-৬ মাস বয়সে ছাগল যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। উন্নত খাবার ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অল্প বয়সের ছাগলকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ মায়ের দৈহিক বাড়ন ও পেটের শিশু ছাগলের বাড়ন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলা বেশি উৎপাদক পরিপন্থি। এজন্য আদর্শ খামার ব্যবস্থাপনায় স্ত্রী ছাগলের বয়স হলে প্রথম প্রজনন করানো হয়। এতে প্রথম বাচ্চা প্রসব হয় ১৮ মাস বয়সে।

ছাগীকে পাল দেওয়ার নিয়ম ও সময় ঃ

ছাগীকে সম্ভব হলে ১২ ঘন্টা ও ২৪ ঘন্টা সময়ের মাথায় দুইবার পাল দিতে হবে। পাল দেওয়ার ৫ মাসের (১৪০-১৫০ দিন) মধ্যে ছাগী সাধারনত বাচ্চা দেয়।

প্রজননের জন্য পাঁঠা নির্বাচন ঃ

৪-৬ মাসের মধ্যেই পাঁঠা পাল দেওয়ার লক্ষণসমূহ দেখায়। তবে ৮ মাস বয়সের আগে পর্যন্ত পাঁঠাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। একই পাঁঠা দিয়ে প্রজননকৃত ছাগীকে পাল দেওয়া যাবে না। সপ্তাহে ৪-৫ বার পালের কাজে পাঁঠাকে ব্যবহার করা উচিত। আকারে বড়, আকর্ষণীয় নীরোগ এবং প্রজননে উদ্যোমী পাঁঠাকেই ব্যবহার করা উচিত। নিকট রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন পাঁঠা দিয়ে ছাগীকে পাল দেওয়া যাবে না। ভালভাবে খাওয়ালে ৮-১০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রজননের কাজে সক্ষম থাকে।

ছাগলের দাঁত দেখে বয়স নির্ণয়ঃ

অস্থায়ী/দুধের দাঁত সবগুলো থাকলে ছাগলের বয়স ১২ মাসের নিচে। মাঝের ১ জোড়া স্থায়ী দাঁত উঠলে ছাগলের বয়স ১২-১৫ মাস। ২ জোড়া স্থায়ী দাঁত উঠলে ছাগলের বয়স ১৬-২৪ মাস। ৩ জোড়া স্থায়ী দাঁত উঠলে ছাগলের বয়স ২৫-৩৬ মাস। ৪ জোড়া স্থায়ী দাঁত উঠলে ছাগলের বয়স ৩৭ মাস থেকে উর্দ্ধে হবে।

নবজাতক বাচ্চা ছাগলের যত্ন ঃ

- নবজাত ছাগলের বাচ্চাকে শুকনা খড় বিছানো জায়গায় রাখতে হবে।
- কোন ভাবেই বাচ্চার যাতে ঠান্ডা না লাগে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শীতকালে রাত্রে বাচ্চাটিকে সামান্য তাপ (পার্শ্বে আগুন জ্বালিয়ে) দিতে হবে।
- শীতকালে দিনের বেলা সূর্যালোকের সাহায্যে এবং খড় বিছানো শুকনা জায়গায় রেখে বাচ্চার শরীর গরম করতে হবে।
- নবজাত বাচ্চার জন্য ছাগীর শালদুধ খুবই জরুরী।
- বাচ্চার জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ (৭দিন) দুধ দোহন করা উচিত নয়।

- জন্মের পরপরই বাচ্চাকে গোসল করানো যাবে না।

বাংলাদেশে ছাগলের রোগ-ব্যাধিঃ

ছাগলের বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। তবে গবাদিপশু অপেক্ষা ছাগলের রোগ ব্যাধি কম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ছাগলের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কৃমি, উকুন, নিউমোনিয়া, পাতলা পায়খানা, আমাশয়, পেট ফাঁপা, মূত্র নালীতে পাথর, পিপিআর, গোটপক্স, চর্মরোগ (মেইজ) ছাগলের ক্ষুরা রোগ, চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস এবং একথাইমা রোগ অন্যতম। নিচে ছাগলের পিপিআর ও গোটপক্স রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার প্রদত্ত হলোঃ

পিপিআর রোগের লক্ষণসমূহঃ এটি ভাইরাস ঘটিত একটি রোগ, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম দেখা যায়।

- হঠাৎ ছাগলের শরীরের তাপ বেড়ে যায় (১০৪০ - ১০৫০)।
- ক্ষুধা মন্দা দেখা যায় এবং কাশতে থাকে।
- মুখের লালা ঝিল্লিতে রক্ত জমে লাল দেখা যায়।
- নাক দিয়ে সর্দি ও পানি ঝরে।
- সর্দি শুকিয়ে আসে এবং নিশ্বাসে পচা গন্ধ বের হয়।
- নাকের ছিদ্রের পর্দায় ঘা দেখা যায়।
- চোখে পিঁচুটি হয়, অনেক সময় চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গল ছাগলের মাংস সুস্বাদু এবং চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজার আছে

- রোগ শুরুর ৫-১০ দিনের মধ্যেই ছাগল মারা যায়।

প্রতিরোধঃ আক্রান্ত ছাগলকে বের করবেন না। ছাগল সুস্থ অবস্থায় টিকা দিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

গোটপক্স রোগের লক্ষণসমূহ ঃ

- মুখের চারপাশে, মুখ গহ্বরে, কানে, গলদেশে, দুধের বাটে এবং পায়ু পথে বসন্তের গুটি দেখা যায়।
- দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং কিছু খায় না, জাবর কাটে না।
- ছাগলের পাতলা পায়খানা হয়।

প্রতিরোধঃ এই রোগ হলে অন্যান্য সুস্থ ছাগলকে টিকা দিতে হবে। আক্রান্ত ছাগল বিক্রি করা উচিত নয়। পাল থেকে আক্রান্ত ছাগল সরিয়ে আলাদা রাখতে হবে।

কৃষিবিদ মোঃ নিয়ামুল কবীর, সিঃ প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি

আমাদের দেশে

প্রাচীন বৌদ্ধবিহার

বৌদ্ধ বিহারে ৯৪টি বিভিন্ন আকৃতির ঘরের চিহ্ন আছে

যশোর জেলার কেশবপুর থানার ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণের ভরত ভয়না গ্রাম। সেই গ্রামেই আছে একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। ইতিহাসবিদরা মনে করেন বহু প্রাচীন কালে এই বিহারটি নির্মিত হয়েছিলো। স্থানীয়দের কাছে এটি ভরতের দেউল বা ভরত রাজার দেউল নামে পরিচিতি। এটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার বুড়ি ভদ্র নদীর কাছেই অবস্থিত। সোমপুর মহাবিহার, শালবন বিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহারের নকশার মতই এই বৌদ্ধবিহারটি বর্গাকার। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এটিই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত একমাত্র বৌদ্ধবিহার। এই স্থাপনার চারিদিকে রয়েছে প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণের পথ। স্থাপনার মাথায় রয়েছে একটি চারকোণা ইটের মঞ্চ। পার্শ্ববর্তী ভুমি থেকে ১১ মিটার উঁচু ৯৪টি বিভিন্ন আকৃতির ঘরের কাঠামোর চিহ্ন রয়েছে এখানে। এই প্রাচীন স্থাপত্যটি দেখতে প্রতিদিন অনেক মানুষ এখানে ভিড় জমান। এই ভরতের দেউল দেখার ভালো সময় হচ্ছে সুর্য ওঠা ও অস্ত যাবার সময়ে। তখন চমৎকার আলোর খেলা দেখা যায়।

এই স্থাপনার দক্ষিণ দিকে একটি প্রাচীন বট গাছ আছে। যা এই স্থানের আর্কষণ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান সময়ে স্থানীয় প্রশাসন স্থাপত্যটিকে আরো আর্কষণীয়

করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে, যাতায়াতের জন্য পথ প্রশস্ত করে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এই স্থাপত্য খননের সময় বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কৃত ইট, দৈনন্দিন ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মৃৎপাত্র ও ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া গেছে। এটি খননের ফলে মানব দেহের বিভিন্ন অংশের কংকাল ও প্রাণীর মাথার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলো খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

এখানে আসতে হলে খুলনা, যশোর অথবা সাতক্ষীর শহর থেকে রওয়ানা হতে হবে। ডুমুরিয়া থানার চুকনগর স্ট্যান্ড থেকে ইজিবাইক, চার্জার ভ্যান ও অটো রিক্স যোগে

স্থাপনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত প্রাচীন বট গাছ

স্থানীয়দের কাছে এটি ভরত রাজার দেউল নামে পরিচিত

ছবি ঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

আবুল কালাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, চুকনগর, খুলনা, ডিএফইডি

আমাদের সংলাপ

ফরিদা বেগম
স্বামী - জয়নাল আবেদীন
ডশমুল মহিলা সমিতি
ডিএফইডি, ফতুল্লা শাখা
নারায়ণগঞ্জ এরিয়া

প্রশ্নঃ সমিতির স্যারেরা কয়েক মাস পর পর সমিতির সব পাশবই অফিসে নিয়ে যান আবার পরের সপ্তাহে ফেরৎ দেন। পাশ বই নিয়ে অফিসে কি করা হয়?

উত্তরঃ আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। সমিতির পাশবই সাধারণত জুন মাসে সঞ্চয়ের মুনাফা দেয়ার জন্য ও প্রতি তিন মাস অন্তর ব্যালেন্সিং এর জন্য অফিসে আনা হয়। প্রতি তিন মাস পরে সমিতির পাশবই অফিসে এনে কালেকশন শীটের সাথে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্থিতি পাশবইয়ের সাথে মিল করা হয়। একে ব্যালেন্সিং বলে। ব্যালেন্সিং এর মাধ্যমে হিসাব ঠিক আছে কি না তা যাচাই করা হয়। প্রতি বছরের মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর মাসে ব্যালেন্সিং করা হয়ে থাকে। এই কাজের সময় পাশবই ও কালেকশন শীটের সঙ্গে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্থিতির মিল করে লাল কালি দিয়ে টিক চিহ্ন দেয়া হয়। বইতে ভুল থাকলে তা বের করে লাল কালি দিয়ে ভুলের স্থান চিহ্নিত করে মাসের শেষে সংশোধন করা হয়ে থাকে।

প্রতিটি বই সংগ্রহ করার পরে সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপক পাশবই ও কালেকশন শীটের সঞ্চয় ও বিনিয়োগস্থিতি পরীক্ষা করে পাশ বইতে স্বাক্ষর দেন। পরে শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরসহ বই সদস্যকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া প্রতি জুন মাসে সদস্যদের জমাকৃত সাধারণ সঞ্চয়ের উপর ৬% হারে মুনাফা দেয়া হয়ে থাকে। সদস্যদের সঞ্চয়ের মুনাফা জুন মাসের শেষ সপ্তাহে হিসাব করা হয়। প্রতিটি বইতে সাধারণ সঞ্চয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে পোস্টিং দেয়া হয়ে থাকে।

উত্তরদাতাঃ মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, শাখা হিসাব রক্ষক (ডিএফইডি), ফতুল্লা শাখা, নারায়ণগঞ্জ এরিয়া।

আশ্চর্য পৃথিবী

খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতা

মজার খাবার খেতে কার না-ভালো লাগে। অনেকেই সুস্বাদু খাবার রান্না করে চারপাশে হৈচৈ ফেলে দেন। এই খাবার নিয়ে পৃথিবীর নানান দেশে আছে প্রতিযোগিতা। এসব প্রতিযোগিতায় বহু মানুষ অংশ নেন। একটু অন্য ধরণের খাবার খাওয়া নিয়েই এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হন তাদের জন্য থাকে পুরষ্কার।

এখানে প্রথমেই বলতে পারি রসুন খাওয়ার প্রতিযোগিতা নিয়ে। রসুন আমাদের পরিচিত একটি মশলা। প্রতিদিন রসুন আমাদের রান্নায় ব্যবহৃত হয়। অনেকে স্বাস্থ্যের যত্নে এক কোয়া কাঁচা রসুন খেয়ে থাকেন। কিন্তু যদি আপনাকে একবাটি রসুন দিয়ে বলা হয় এক মিনিটে খেয়ে শেষ করতে? রসুন খাওয়া নিয়ে প্রতি বছর ইংল্যান্ডের ডরসেট নামে একটি জায়গার গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা। এই খেলায় যারা অংশ নেবেন তাদের এক মিনিটে পাত্রের সব রসুন চিবিয়ে খেতে হবে। রসুনের কোয়া গেলা যাবে না।

বিছুটি বা বিচুটি পাতা আমরা সবাই চিনি। এই পাতা গায়ে লাগলে প্রচুর চুলকানি হয় এবং এক পর্যায়ে শুরু হয় ব্যথা। কিন্তু এতসব খারাপ গুণ থাকার পরেও ইংল্যান্ডের এক শহরে বিছুটি পাতা খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে এক ঘন্টা সময়ে একজন প্রতিযোগীকে মুখ দিয়ে বিছুটির একটি ডাল থেকে পাতা খেতে হবে। এক ঘন্টায় যিনি বেশি পাতা খেতে পারবেন তিনি-ই হবেন বিজয়ী। গত বছর ইংল্যান্ডেই এক প্রতিযোগী এক ঘন্টায় ৮৬টি পাতা খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ রয়টার, ভোরের কাগজ, ছবিঃ গুগল

ছবিটি এঁকেছে:
মো: আলিফ
প্রথম শ্রেণি, হাসনাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসনাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী জেলা

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission